পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে রচিত বাংলা সাহিত্য ও অশনি-সংকেত

সাহিত্য ও যুগজীবন তথা জাতীয়জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাহিত্য প্রধানত যুগেরই দান। অর্থাৎ একটি বিশেষ যুগে কোন জাতির সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, চিন্তা-চেতনা সেই যুগে রচিত সাহিত্যে রূপায়িত হয়। এই শ্রেণীর সাহিত্যকে যুগসম্ভব সাহিত্য বলতে পারি। আর এক শ্রেণীর সাহিত্য আছে, তার জন্য সমসাময়িক কাল প্রস্তুত থাকে না; সাহিত্যিক তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের দ্বারা অন্য একটি নূতন যুগের আবির্ভাবকে সম্ভবায়িত করেন। এই শ্রেণীর সাহিত্যকে আমরা যুগস্রষ্টা সাহিত্য বলতে পারি। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের উদাহরণ প্রচুর কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য 'কোটিকে গুটিক' না হলেও মোটেই সহজলভ্য নয়। এই যুগস্রষ্টা বা যুগন্ধর সাহিত্য হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এবং রাশিয়ার ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' বিস্ময়কর সৃষ্টি। আলোচনা যাই বলুক, 'আনন্দমঠ'-এর মাতৃমন্ত্রী সন্তানদল নবজাগ্রত বাংলা তথা ভারতের দেশাত্মবোধকে যে উদ্দীপ্ত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন সন্দেহ নেই পাভেলের মা রাশিয়ায় মুক্তি-আন্দোলনকে প্রাণিত করেছিল। তবে অন্যান্য শিল্পকীর্তির ন্যায় সাহিত্যও তার অতীত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' রচনা করেছিলেন (১৮৮২ খ্রীঃ প্রকাশিত) তাঁর সময় থেকে একশত বৎসরেরও অধিককাল পিছিয়ে গিয়ে ১৭৭০ খ্রীঃ বা ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের পটভূমিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে সেই মন্বন্তরের একটি সংক্ষিপ্ত লিপিচিত্র এখানে উদ্ধৃত করি ঃ

'লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়! — উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল, জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা

পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।'

পঞ্চাশের মন্বন্তরেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সাহিত্যরূপ 'আনন্দমঠ' ব্যতীত আর কিছু জানা নেই, কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে রচিত সাহিত্যসম্ভার বিপুল। তার সম্যক্ পরিচয় এই প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে দেওয়া সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নেই। শুধুমাত্র ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ অনুধাবনের জন্য সূত্রাকারে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ হল।

উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ

পঞ্চাশের এই মহামন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট বাংলা উপন্যাসের পরিচয় দিতে গেলে বিভূতিভূষণের 'অশনি-সংকেত'-র নাম প্রথমেই করতে হয়। তবে উপন্যাসটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে বলে এখানে তার পুনরাবৃত্তি না করে এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকলে তা এই প্রবন্ধের উপসংহারে বলা যাবে।

এরপর বাস্তব সমাজসচেতন লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭১) 'মন্বন্তর' (১৯৪৪) উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্কর এ উপন্যাসে নগরজীবনকে প্রথম সাহিত্যের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি খণ্ড খণ্ড গল্পের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিচয় দিয়েছেন। নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে, জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে, এইসব কাহিনী তারাশঙ্কর সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। শহরই এখানে মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছে।

এই মন্বন্তরকে উপজীব্য করে গোপাল হালদারের (১৯০২-১৯৯৩) ত্রয়ী উপন্যাস হল 'পঞ্চাশের পথ' (১৯৪৪) 'ঊনপঞ্চাশী' (১৯৪৬) ও 'তেরশ পঞ্চাশ' (১৯৪৫)। এই তিনটি উপন্যাসে লেখক পর্যায়ক্রমে মন্বন্তরের ইঙ্গিত, মন্বন্তরের ভয়ঙ্কর রূপ ও তার পরিণামের চিত্র উদঘাটন করেছেন। মননশীল লেখক এখানে শুধু দুর্ভিক্ষের ভয়াল চিত্রই অঙ্কন করেন নি, তিনিও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। এবং রাজনৈতিক শক্তিগুলির প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়াও বিশ্লেষণ করেছেন। তাই এই তিনটি উপন্যাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এই পটভূমিতে সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২) লিখেছিলেন 'কালো ঘোড়া' (১৩৫৩) উপন্যাস। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের করুণ কাহিনী রচনা করার পাশে পাশে লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, এই মনুষ্যসৃষ্ট মন্বন্তরের প্রধান কারণ হল দুর্নীতি। দুর্নীতি সমাজের একেবারে মেরুদণ্ডে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেছেন—'এরপর যুদ্ধ একদিন থামবে, ব্ল্যাকমার্কেটও বন্ধ হবে। কিন্তু এই দুর্নীতির যক্ষ্মা—এ সহজে ছাড়ছে না।'

এছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) 'চিন্তামণি' (১৯৪৬), সুবোধ ঘোষের (১৯০৮-১৯৮০) 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪) এবং অমলেন্দু চক্রবর্তীর (১৯৩৪-) 'আকালের সন্ধানে' (১৯৮২) এই দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা। শেষ উপন্যাসটির উপস্থাপন-রীতি অভিনব। অমলেন্দু চক্রবর্তী নিজেই বলেছেন—'উপন্যাসটা ত্রিকৌণিক —(ক) প্রত্যক্ষ পটভূমি উনিশশ' আশির গ্রাম; (খ) ভাবনার জমি তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ,

(গ) আধার একটি ফিল্ম-ইউনিটের বহু বিচিত্র মানুষজন, সুদূর গ্রামে তাদের দলবদ্ধ ক্যাম্পজীবন, চিত্র-নির্মাণের অনুপুঙ্খ খুঁটিনাটি।'

এছাড়াও কিছু উপন্যাস আছে।

ছোটগল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার দুর্ভিক্ষকে নিয়ে 'ভিড়', 'পার্থক্য', 'বরোবাগ্‌দিনী' ছাড়া স্মরণযোগ্য ছোটগল্প তেমন লেখেননি। 'বরোবাগ্‌দিনী' গল্পে বস্ত্রাভাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

তারাশঙ্করের 'পৌষলক্ষ্মী' গল্প মন্বন্তরে ক্ষতিগ্রস্ত একটি গ্রামকে নিয়ে রচিত হলেও দুর্ভিক্ষের হাহাকারই এর প্রধান বক্তব্য বিষয় নয়; বেঁচে থাকার গভীর আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও মর্ত্যপৃথিবী থেকে বিদায় নেবার করুণ ট্র্যাজেডিই এ গল্পে ব্যঞ্জিত হয়েছে। তাঁর 'বোবা কান্না', 'ইস্কাপন' প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পরিমল গোস্বামীর 'কৃষ্ণহরির চাল' এবং 'তারিণী মাস্টার' গল্প দুটি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লেখা। প্রথমটিতে কালোবাজারি এবং দ্বিতীয় গল্পে চোরাবাজার সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য পরিস্ফুট। তাঁর 'শেষের হিসাব' ও 'পরিচয়' গল্প দুটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা।

মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭) 'মন্বন্তর', 'বন্যা', 'কন্ট্রোলের লাইন', 'মানুষ ও গোরু' প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প লেখেন। 'মন্বন্তর' গল্পের পরিবর্তিত নাম হয় 'দ্বীপের মানুষ'। বিলাসী সচ্ছল মানুষরা যে নিঃস্ব রিক্ত মানুষদের ব্যথা-বেদনা বোঝে না, নিজেদের সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে এটাই এ গল্পের বক্তব্য। 'বন্যা' গল্পের চালের মূল্যবৃদ্ধি এবং চাল-মালিকদের অন্যায় আচরণের কথা আছে। 'কন্ট্রোলের লাইন' গল্পে আছে যুদ্ধকালীন কন্ট্রোল ব্যবস্থার কথা। 'মানুষ ও গোরু' গল্পে যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জমিদারের কর্মচারীদের দ্বারা চাষীদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায়ের কথা আছে।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২) তাঁর 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী' গল্পে দেখিয়েছেন, পঞ্চাশের মন্বন্তর শুধুমাত্র মনুষ্যসৃষ্ট নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগও এর কারণ। ঝড়, বন্যা এবং পোকার আক্রমণে আউশ ধান এবং আমন ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাঁর 'আগুন' গল্পে যুদ্ধের সময়ে চাল, কয়লা প্রভৃতি সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্নিমূল্যের কথা আছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) কেরোসিন-সঙ্কট নিয়ে লিখেছেন 'কেরোসিন' গল্প, বস্ত্রাভাবের কথা আছে তাঁর 'বস্ত্র' গল্পে এবং 'হাড়' গল্পটি নারী বিক্রয়ের কাহিনী নিয়ে রচিত।

প্রবোধকুমার সান্যালের (১৯০৫-১৯৮৩) 'অঙ্গার' একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। তিনি দেখিয়েছেন, বিরাট মহানগর একদিকে হয়ে উঠছে বাঙালীপ্রধান এবং অন্যদিকে যুদ্ধের সময়ে কালোবাজারীর সুযোগে ধনী হয়ে যাচ্ছে আরও ধনী। তিনি দুর্ভিক্ষের একটি মর্মান্তিক চিত্র এঁকেছেন এই গল্পে—'আগে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে, যদি দুটি চাল পাওয়া যায়। তারপর হল ভাঙা কলাইয়ের থালা, যদি চারটি ভাত কোথাও মেলে। তারপর হাতে নিল হাঁড়ি, যদি একটু ফ্যান কেউ দেয়। আর এখন, কেবল কান্না—কোথাও কিছু পায় না।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) মন্বন্তরের পটভূমিতে বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট

ছোটগল্প রচনা করেছেন। গল্পগুলি, 'আজ-কাল-পরশুর গল্প' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর 'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পে আছে অন্নসংকটের কথা, 'প্রাণের গুদাম' গল্পে খাদ্যসংকট এবং খাদ্যসংকট-সৃষ্টিকারী দুয়েরই কথা বলা হয়েছে। 'নমুনা', 'নেড়ি', 'অমানুষিক' প্রভৃতি গল্পে আছে নারী-নির্যাতনের কাহিনী। বস্ত্র-সংকটের পটভূমিতে রচিত তাঁর 'দুঃশাসনীয়' একটি অসাধারণ গল্প। গল্পের শিরোনামটি গভীর ব্যঞ্জনাবহ। মহাভারতের একজন দুঃশাসন একটি রমণীর বস্ত্র হরণ করেছিল। কিন্তু একালে শত শত দুঃশাসন হাজার হাজার নারীর বস্ত্রহরণ করেছে। তারাও নির্লজ্জ। 'রাঘব মালাকর' গল্পটিও বস্ত্রসমস্যা নিয়ে লেখা। তবে এতে শুধু বস্ত্রসমস্যাই দেখানো হয়নি, সমস্যা-সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও আছে।

এছাড়া গজেন্দ্রকুমার মিত্রের (১৯০৮-১৯৯৪) 'ম্যায় ভুখা হুঁ', সোমনাথ লাহিড়ির (১৯০৯-১৯৮৪) '১৯৪৩', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫) 'আবরণ', 'রূপান্তর', 'পুনশ্চ' প্রভৃতি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০) 'নক্রচরিত', নবেন্দু ঘোষের (১৯১৭-) 'বাঁকা তলোয়ার', 'কল্কি', ননী ভৌমিকের (১৯২১-) 'একটি দিন ১৯৪৪', 'কাফের' প্রভৃতি গল্প এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আরও কিছু সার্থক সৃষ্টি হয়তো অগোচরে থেকে গেছে।

নাটকে পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ

নাটক বস্তুনিষ্ঠ রচনা এবং নাটককে বলা হয় সমাজের দর্পণ। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬), মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রভৃতি রচনায় তদানীন্তন সমাজের সমস্যাসঙ্কুল জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নীলকর শাসনে অত্যাচারিত বাংলার রায়তদের জীবনও দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এইভাবে পঞ্চাশের মন্বন্তরও হয়ে উঠেছে বাংলা নাটকের উপজীব্য।

বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮) ছিলেন গণনাট্য আন্দোলনের পরোধা। নাটকে জনগণের সুখ-দুঃখপর্ণ জীবনালেখ্য রচনা করাই ছিল এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। বিজন ভট্টাচায প্রথমে 'আগুন' (১৯৪৩) ও 'জবানবন্দী' (১৯৪৩) দু'খানি নাটক রচনা করেন। দুটি নাটকেই খাদ্যাভাবের কথা আছে। প্রথমটি ক্ষুদ্র ক্ষদ্র ঘটনা নিয়ে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা এবং দ্বিতীয়টি কিছটা সংহত রচনা। কিন্তু কোনটাই পূণাঙ্গ নাটক নয়। তাঁর পূণাঙ্গ নাটক 'নবান্ন' (১৯৪৪)। ডঃ বিনতা রায়চৌধুরী বলেন—'নবান্ন বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'জবানবন্দী'রই সম্প্রসারিত রূপ। 'নবান্ন' নাটক দিয়েহ গণনাট্য সঙ্ঘের দঢ় ভিত্তি রচিত হয়।' মন্বন্তরপীড়িত গাম্য কৃষকের দুরবস্থা নিয়ে 'নবান্ন'-র মত আর কোন নাটক রচিত হয়নি।

'নবান্ন' গ্রাম এবং শহরের বিরাট প্রেক্ষাপটে রচিত। এ নাটকের ৪টি অঙ্ক এবং মোট দৃশ্য সংখ্যা প্রায় ১৫। একটি দুর্গত গ্রামের নিরন্ন মানুষদের কথা দিয়েই নাট্যকার সমগ্র দেশের অনাহার-ক্লিষ্ট নরনারীর জীবনকথা রূপায়িত করেছেন। প্রথম অঙ্কে গ্রামের অন্নহারা মানুষের হাহাকার এবং দুঃস্থ মানুষদের উপর ধনীদের অত্যাচারের চিত্র এঁকেছেন। তার পরের অঙ্কে পটভূমি গ্রাম ছেড়ে শহর। গ্রামের মানুষ একমুঠো ভাতের জন্য সকলে গ্রাম ছেড়ে শহরে ভিড় জমিয়েছে। রাস্তায়, ফুটপাথে, পার্কে অগণ্য ভিখারির দল। এরই মধ্যে

প্রেস ফটোগ্রাফাররা মজা করে এই কঙ্কালসার ভিক্ষুকদের ফটো তুলছে তাদের কাগজের জন্য। কোথাও বা চালের মজুতদার চালের বস্তা গুদামে লুকোচ্ছে, মানুষকে চাল দিচ্ছে না। এরই মধ্যে নারী-ব্যবসা চলছে। কোথাও সরকারী ব্যবস্থায় লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। খোলা হয়েছে দাতব্য চিকিৎসালয়। কিন্তু রোগী আছে অসংখ্য। প্রয়োজনীয় ওষুধ নেই। ফলে মানুষ মরছে অনাহারে এবং বিনা চিকিৎসায়। কোথাও প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বিয়ের রাতে আলোর রোশ্‌নাই, ভোজ্যবস্তুর অঢেল ব্যবস্থা; উত্তম পোশাকে সজ্জিত নরনারীর সমারোহ। সামনে অন্ধকারাচ্ছন্ন ডাস্টবিন থেকে এঁটো পাতা নিয়ে কুকুরে-মানুষে টানাটানি করছে। নাটকের শেষ দিকে গ্রামের মানুষ যারা বেঁচেছিল, তারা আবার গ্রামে ফিরে গেছে। তারা ভাঙা কুঁড়ে আবার গুছিয়ে তুলছে আগামী দিনে বেঁচে থাকার জন্য। কবি সত্যেন্দ্রনাথের কথা—'মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি।'—সত্য হয়ে উঠেছে।

বিজন ভট্টাচার্যের পরবর্তী নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) তাঁর 'রাজধানীর রাস্তায়' নামক একাঙ্কিকায় মন্বন্তরের করাল চিত্র তুলে ধরেছেন। তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯) 'ছেঁড়া তার' (১৯৪৪) এবং 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৬) নামে দুটি নাটক রচনা করেন মন্বন্তরের পটভূমিকায়। প্রথমটিতে আছে রংপুর জেলার কৃষক সমাজের দুরবস্থার কথা এবং দ্বিতীয়টিতে আছে বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাংলায় খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাবের কথা। এছাড়া বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) 'নমুনা', জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (১৯২৩-১৯৯৪) 'চালের দর' নামে একটি করে একাঙ্ক নাটক রচনা করেছিলেন।

প্রবন্ধে পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ

স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এগুলির নাম যথাক্রমে 'রাষ্ট্র সংগ্রাম', 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', 'বাংলার সংকট', 'দায়ী কে?', 'খোলা চিঠি', 'প্রতিকারের উপায়' প্রভৃতি। প্রবন্ধগুলি তাঁর 'রাষ্ট্রসংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধের মধ্যে প্রবন্ধকার মন্বন্তরকালীন সরকারের খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থার যেমন সমালোচনা করেছেন, তেমনি ত্রাণকার্যে সরকারী নিষ্ক্রিয়তাকেও আক্রমণ করেছেন। সরকার কর্তৃক বাংলার মন্বন্তরের বারোটি কারণকেও সমালোচনা করতে ছাড়েননি তিনি। প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যেই শ্যামাপ্রসাদের গভীর চিন্তা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এছাড়া গোপাল হালদার তাঁর "বাঙালী সংস্কৃতির রূপ" গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে মন্বন্তর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন এবং সুশীলকুমার বসু তাঁর 'আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস' প্রবন্ধে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

কবিতায় পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ

কবিরা স্বভাবতই বেশি স্পর্শকাতর। জাতীয় জীবনের উত্থান-পতন, সমস্যা-সংকট সহজেই তাঁদের মনকে প্রভাবিত করে। সেই প্রভাব তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয়। এই মহা-মন্বন্তরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সমসাময়িক কবিরা পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি মূল্যবান কবিতা নিয়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'আকাল' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। এতে আঠার জন কবির আঠারটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলি সবই ১৩৫০ সালে লেখা।

'কথামুখ'-এ সম্পাদক বলেছেন, 'তেরোশো পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা গ্রামছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস। তাই যাঁরা প্রকৃত কবির মতো, স্বদেশ-বৎসলের মতো পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের বিভ্রান্ত জনমনকে দিলেন সান্ত্বনা, অন্ধকারে বসে গাইলেন সূর্যোদয়ের গান, তাঁরা আমাদের অভিনন্দনীয়।'

ক্ষুধিত মানুষের জঠরযন্ত্রণা নিয়েই রচিত হল আমাদের লজ্জাকর ইতিহাস। অরুণ মিত্র তাঁর 'জঠর' কবিতায় বললেন—

'আমাদের ইতিহাসে চিহ্ন দিক
ক্ষুধিত জঠর।'

বিষ্ণু দে তাঁর 'চালের কাতারে' কবিতায় বললেন, যাদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে সভ্যতার চাকা গড়িয়ে চলে, তারা আজ নিঃস্ব রিক্ত পথের ভিখারী ঃ

'সভ্যতার ভার
যারা বয় নির্বিচারে, যারা ম'রে জীবিকা জোগায়
আমাদের, শ্রেণীস্বার্থে বঞ্চিত যে ভিখারীর সার
বাংলার পথে পথে, বুঝি সারা হিন্দুস্থান ছায়—'

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষের প্রতিদিনের বিপন্নতার ছবি ঃ

'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাত্রে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।'

রাজপথে অন্নহীন মাতৃস্তন্যহীন কঙ্কালসার অসংখ্য শিশুদের দেখে কবি বিস্ময়াপন্ন হন—কোন্ জীবনীশক্তিতে এরা বেঁচে আছে! 'ফ্যান' কবিতায় তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনে প্রশ্ন জাগে—

'রাজপথে কচি কচি এইসব শিশুর কঙ্কাল
মাতৃস্তন্যহীন
দধীচির হাড় ছিল এর চেয়ে আরো কি কঠিন?'

এই মন্বন্তর যে মনুষ্যসৃষ্ট, সে বিষয়ে কবিরাও নিঃসন্দেহ। সভ্যতার শত্রু মজুতদার, শোষক সমাজের প্রতি কবির অভিশাপবাণী তাই বজ্ররোষে ধ্বনিত হয়। 'লাশ' কবিতায় ফররুখ আহ্মদ বলেন—

'মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ।
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ,
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃংখলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নম—দ্বারপ্রান্তে টানি'—

আজ এই ক্লেদাচ্ছন্ন, উৎপীড়িত নিখিলের অভিশাপ বও
ধ্বংস হও, তুমি ধ্বংস হও॥'

কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই হোক বা মনুষ্যসৃষ্ট মহা সংকটই হোক, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কুয়াশাকে বিদীর্ণ করে নতুন সূর্য ওঠে, মানুষকে আশায় ভর করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে হয়, বিবেক ও চৈতন্যকে রক্ষা করতে হয় অতি সাবধানে। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর 'মেঘমুক্ত' কবিতায় সে-কথাই বলেছেন—

'শূন্য মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বশে ও বিকারে
তবু গিয়ে নাহি যেন পড়ি কারো ষড়যন্ত্র জালে;
ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ থেকে সযতনে দূরে রাখি জীবনের ম্লান বর্তিকারে।'

এক আত্মম্ভর আশায় কবি সঞ্জীবিত হয়েছেন এবং বিপন্ন মানুষকেও তিনি সেই আশায় প্রাণিত করেছেন। 'স্বাগত' কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই সোনালী স্বপ্নের চিত্র এঁকেছেন—

'পথে পথে পদশব্দ ওঠে,
আকাশে নক্ষত্র ফোটে;
নদী করে সম্ভাষণ পাখি করে গান;
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে
ধান আর ধান।'

মন্বন্তরকে উপজীব্য করে কিছু গানও রচিত হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা গান' গ্রন্থের প্রস্তাবনা থেকে জানা যায় নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী তাঁর নাটক (ছেঁড়া তার, দুঃখীর ইমান, বাংলার মাটি প্রভৃতি)-এর জন্য কিছু গান রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি গান ঃ

ভুলো না রেখো মনে বাঁচবে যত কাল
সোনার দেশে ক্যান এলো পঞ্চাশের আকাল।
ভুলে রব লড়াই এল দেশে
চোরেরা সব দল বাঁধে ভাই রক্ষকেরই বেশে—
তারা বাগিয়ে ভুঁড়ি হাঁকায় জুড়ি লুটের মালে লালে লাল।
এলো পঞ্চাশের আকাল॥

... ...

ওরা ফ্যান বিলিয়ে নাম কিনে নেয়
কাঙাল মরে পালে পাল—
এলো কাল পঞ্চাশের আকাল॥

সম্পূর্ণ গানটির মধ্যে কবি মন্বন্তর-ক্লিষ্ট শোষিত মানুষ ও শোষক শ্রেণীর একটি বিশ্বস্ত চিত্র এঁকেছেন। এবং দুঃখী মানুষকে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনিয়ে ভবিষ্যতে বাঁচার আশ্বাসও দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে আসে গণনাট্য সংঘের পুরোধাপুরুষ সলিল চৌধুরীর গান 'গাঁয়ের বধূ', যা শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুগীত হয়ে আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। নবনাট্য-আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে বাংলা গান সেদিন এক নব

দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছিল। সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় জানিয়েছেন— 'সলিল চৌধুরী আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সমন্বয় ১৯৫০-এর দশকে সেই আশ্বাসই জাগিয়েছিল বিপুলভাবে। 'গাঁয়ের বধূ' বাংলা গানের খুব বড় পালা বদলের ও জনপ্রিয়তার দ্যোতক।' গানটির রচনাকাল ঠিক জানা নেই। তবে রচনার সময়ে গীতিকারের মনে মন্বন্তরের পূর্বের শান্ত স্নিগ্ধ এবং মন্বন্তর কবলিত বিপন্ন সময়ের করুণ স্মৃতি যে জাগরূক ছিল তা গানটির কথাবস্তু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় ঃ

প্রথমেই বলা হয়েছে, গাঁয়ের বধূর এই কথা রূপকথা নয়, জীবনের মধুমাসের কুসুমছেঁড়া গাঁথা মালা শিশির-ভেজা সে কাহিনী। একটুখানি শ্যামল ঘেরা কুটিরে এক কিষাণ এবং কিষাণ-বধূ তাদের স্বপ্নের নীড় রচনা করেছিল। তাদের ঘুঘুডাকা ছায়ায়-ঢাকা গ্রামখানি রূপকথার গ্রাম নয়, কিন্তু রূপকথার মতই তা সুন্দর। 'সেখানে বারো মাসে তেরো পাবন' লেগে থাকতো। কিন্তু হঠাৎ এলো বিপর্যয় —

'হায় রে কখন
এলো সমন
অনাহারের বেশে
সেই কাহিনী শোনাই শোনো।'

'অশনি-সংকেত' উপন্যাসে নতুন গাঁয়ে অনঙ্গ-বৌয়ের সংসার-জীবনের স্মৃতিটাও তো অনেকটা এমনই ছিল। কিন্তু তারপর দুর্ভিক্ষ এলো ডাকিনী যোগিনী শত শত নাগিনী এবং পিশাচের বেশে। কুটিলের মন্ত্রে শোষণের যন্ত্রে নিঃশেষ হয়ে গেল শত সহস্র প্রাণ। আমাদের সেই কিষাণ এবং কিষাণীর জীবনও তার থেকে বাদ গেল না। প্রত্যক্ষদর্শী কবি সেই ব্যথার পাষাণ আজ বয়ে বেড়ান।

এরপর গানের অন্তিম পংক্তিগুলি স্মরণ করুন—

'আজও যদি তুমি
কোন গাঁয়ে দেখো
ভাঙা কুটিরেরও সারি।
জেনো সেইখানে
সে গাঁয়ের বধূর
আশা-স্বপনের সমাধি।।'

আমাদের অনঙ্গ-বৌও পদ্মবিলের ধারে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল, তার নতুন গাঁয়ের ঘরের থেকেও হয়তো সুন্দর। 'অশনি-সংকেত'-এ সংকেত দিয়ে শেষ হয়েছে; শেষ পরিণতি যদি রচিত হত তাহলে গানের সঙ্গে কাহিনীর হয়তো উপসংহারটুকু মিলিয়ে নেওয়া যেত।

বিভূতিভূষণের 'অশনি-সংকেত'-এ যদিও মন্বন্তরের সার্বিক রূপ চিত্রিত হয়নি, সর্বনাশের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু উপন্যাসের শেষে আশাবাদেরই ব্যঞ্জনা আছে। গঙ্গাচরণের জমির প্রতি গভীর মমতা এবং অনঙ্গ-বৌয়ের বীজ সংরক্ষণের প্রয়াসে কৃষির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির আভাস আছে। গ্রামের বিপন্ন মানুষের কাছে এ যেন দূরদর্শী মনস্বী লেখকের দিগ্‌দর্শন। কৃষির উন্নতিতেই আছে অন্নহারা মানুষের মুক্তি। মন্বন্তর-প্রভাবিত সাহিত্যের অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকই নগরবাসী। নাগরিক জীবনের ছবিই তাঁদের রচনায় বেশি করে ফুটেছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ গ্রামের মানুষ, মাটিমাখা মানুষের সুখ-দুঃখের

অংশীদার হয়ে তাদের জীবনকে তিনি সাহিত্যে বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। তাই 'অশনি-সংকেত' মন্বন্তর-ক্লিষ্ট গ্রামীণ জীবনের অনন্য ঐতিহাসিক দলিল। কিন্তু সমসাময়িকতার চাপে চিরন্তন মানবিকতাবোধ একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। অর্থাৎ খাদ্যাভাবে মহা মন্বন্তর হলেও সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের মন্বন্তর ঘটেনি; জীবনশিল্পী বিভূতিভূষণ এটাই দেখাতে চেয়েছেন।